পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রবণ মাধ্যম :
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতার প্রত্যাশার মহামন্ত্র ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বর্তমানে মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষ সারা বিশ্বের তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে পারে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা এমন ছিল না। তথ্য পাওয়ার জন্য একমাত্র ভরসাই ছিল বেতার। মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে অবরুদ্ধ জনতা বন্ধ ঘরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতেন। শব্দ যাতে শত্রপক্ষ না শুনতে পায় সেজন লেপ-কাঁথার তলায় লুকিয়ে পাকহানাদার বাহিনীকে অপবাদ দিয়ে রঙ্গরস মূলক অনুষ্ঠানের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা বাহিনী শুনতে উৎগ্রীব ছিল বাঙালি জনতা। বিপদের মুখে পতিত হওয়া বাংলাদেশী জনতা জঙ্গি পাকবাহিনীর কাছে জিম্মি অবস্থায় আশারবাণী শুনতে পেলে তা আকঁড়ে ধরবে এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল সেই ত্রাতার ভূমিকায়। বেতার কেন্দ্র হতে রণাঙ্গনের বিজয়গাথা অনুষ্ঠানাদি প্রচার হতো। এতে বাঙালি আশান্বিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় হতো। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে ফাঁকা নিবেদিত ছিল দেশের জন্য তাঁরা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকরা ও তেমনি পুজনীয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্বিক লড়াইয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল অপরিহার্য হাতিয়ার। ডিজিটালাইজেশনের সর্বশেষ পর্যায়ে ও যুদ্ধের সময় বেতারের ভূমিকা সর্বাগ্রে। চিত্র বা ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠাতে হলে তা ক্যামেরায় ধারণ করার প্রয়োজন কিন্তু বেতারে পাঠাবার জন্য ধারণ করার প্রয়োজন নেই। শুধু তথ্য বা উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত কিছু পাঠাবার জন্য শুধু কোন গোপনীয় স্থান হতে শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের প্রয়োজন। পাকহানাদার বাহিনী প্রচার মাধ্যম ধ্বংস করার পরও ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেষবারের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পাকিস্তান বেতারের ব্যবহৃত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে অত্যন্ত সন্তর্পনে বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে প্রচার হয়েছিল যা ঐ সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ও সাহস যুগাবার বর্তিকা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানমালা। বেতারের গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তুলে ধরেন। 'বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যবাহী। এই বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণ সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালীর মনোবলকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দিবারাত্র কাজ করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার প্রচার মুক্তিযুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে সর্বাত্মকভাবে। এই বেতার কেন্দ্রের এক একটি শব্দ ইথার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এক একটি বুলেট হয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইউনিটগুলি এবং শত্রু কবলিত

এলাকার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখেছেল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রথম প্রচারিত হওয়ার এক ঘন্টা কালের মধ্যে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ বিশ্বের জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল'।[১] পাকবাহিনী চরম হত্যাযজ্ঞের প্রথম প্রতিবাদই ছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। বেতার কেন্দ্রের হৃদয়নিংড়ানো অমিত বাণী ও তেজস্বী ভাষা মুক্তিকামী বাংলাদেশীদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে দীপ্ত পায়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।

এই লক্ষ্যেই স্বাধীনতাকামী কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মীর প্রথম প্রয়াস 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এই বেতার কেন্দ্রটি এতোটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা বাঙালির মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের শপথের পর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িটিতে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীগণ থাকতেন। এই সরকারের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বের একটি কাজ হলো বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। তাই এই বাড়ির একটি কক্ষ ছেড়ে দেয়া হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫শে মে চট্টগ্রামে গঠিত হওয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটিতে স্থানান্তরিত হয়।

দোতলার সিঁড়ির নিকট প্রথম কক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মাঝে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর কক্ষ। আর তৃতীয় কক্ষেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত স্টুডিও। এই ভবনের নীচ তলায় থাকতেন প্রবাসী সরকারের দু'জন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

ক্ষমতাসীন আগ্রাসীশক্তি নিরস্ত্র জনতার ওপরে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে গণহত্যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযোগ্য হলে তা জনগণকে তথা বিশ্ববাসীকে তুলে ধরার জন্য বেতার যে কতটা প্রয়োজন তা শুরুতেই অনুধাবন করে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রামে কর্মরত স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালাবার দৃঢ় সংকল্প করেন। ১৯৬৪ সালে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে চুক্তিভিত্তিক নিজস্ব লেখক শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করা বেতার কর্মী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকার ও আশেপাশের কয়েকটি দেশের বেতার এ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক ভয়াবহ ও নির্মম হত্যাকান্ডের বিবরণ শুনে ক্রোধ তৈরী হয়। এ সময় বেলাল মোহাম্মদ তাঁর আগ্রাবাদের বাসভবন ছেড়ে এনায়েত বাজারের ডাঃ শফী এবং মুশতারী শফীর বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। বেলাল মোহাম্মদ তাদের পরামর্শে কিছু করার উদ্যোগ নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে কাজী হাবিব উদ্দিন আহমেদ ও আমিনুর রহমান, ২৮ মার্চে রাশেদুজ্জামান রাশেদুল হোসেন ও শরিফুজ্জামন ও ২৯ তারিখে সৈয়দ আবদুস শাকের মুস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরীকে নিয়ে মোট দশ জনের একটি উদ্যোগ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু করেন। এই বেতার কেন্দ্রটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত রামগড়ে আগরতলা সীমান্তবর্তী বগাফর জঙ্গলে একটি অংশ আরেকটি দল আগরতলা শহরে। দু'টি অংশেই এক কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গের

ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইট বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যার পর কালুরঘাটে এক কিলোয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে। পরবরর্তীতে প্রথমে ২০০ ওয়াট শক্তির ও পওে ৪০০ ওয়াট শক্তির শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য প্রথমেই রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রামের ১০ কিলোয়াটের ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের চান্দগাঁওস্থ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসির উদ্দিন, বেতার প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, দেলওয়ার হোসেন ও মোসলেম খানের প্রকৌশলিক সহযোগিতায় ৫ মিনিটের একটি বিক্ষিপ্ত অধিবেশন হয়।

এই সরকার বেতার কেন্দ্রটির গুরুত্ব এতোটাই অনুধাবন করেছিলেন যে প্রবাসী সরকারের অন্য একজন মন্ত্রী কামরুজ্জামান অন্যত্র থাকতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য কী কী করণীয় তা আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে প্রাথমিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে শরণার্থীরদের আশ্রয় এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য অস্ত্রের পাশাপাশি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র চেয়েছিলেন। সরাসরি প্রবাসী সরকারের পরিচালনায় ২৫ মে থেকে চালু হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম কেন্দ্রটির সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল মান্নান এম এন এ। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্ব দেয়া হলো, বেলাল মোহাম্মদ ও আশফাকুর রহমান খানকে অনুষ্ঠানের, সৈয়দ হাসান ইমাম নাটকের, এবং কামাল লোহানীকে বার্তা বিভাগের প্রধান হিসেবে। পরে ইংরেজী ভাষার সংবাদ ছাড়াও অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব পেলেন আলমগীর কবীর।

'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটিই হলো স্বধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সূচনা সংগীত। চট্টগ্রাম থোকেই এটাই সূচনা সংগীত হিসেবে চলে আসছিল। এমনই চমৎকার বর্ণনামূলক রচনাটি গাজী মাজহারুল আনোয়ারের। সুর করেছিলেন চলচ্চিত্রের সুরকার আনোয়ার পারভেজ। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হলো কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে এবং তেলাওয়াত করেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক যুক্তিযোদ্ধা, সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বলেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা সংবাদ পাঠ করেছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম সালেহ আহমদ ছন্দনামে। ইংরেজি সংবাদ পড়েছিলেন আবু নঈম নামে। সংবাদ পাঠক হিসেবে নূরুল ইসলাম সরকার, বাবুল আখতার, আলী রেজা চৌধুরী ছিলেন। ইংরেজী সংবাদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক পরে আলমগীর কবীর, আলী যাকের, নাসরিন আহমদ, জেরিন আহমদ নামে, পারভীন হোসেন একেকটি অধিবেশন গান জীবন্তিকা কথিকা এ ধরণের অনুষ্ঠান দিয়ে সাজানো হয়েছিল। 'বিদ্রোহী কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন কামাল লোহানী। রেকর্ডেড গণসংগীত প্রচার করা হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে অনেক শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, বাদ্যযন্ত্রী, সাংবাদিক, সংবাদ পাঠক ও পাঠিকা এলেন। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি জমজমাট হয়ে উঠল।

স্বাধীন বাংলা বেতার চালু করার পর তথ্য সমৃদ্ধ ও নান্দনিক উপস্থাপনের কারণে গুরত্ব অত্যাধিক মাত্রায় বেড়ে গেল। এর মধ্যে প্রথম শুরু হওয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মীগণ যারা আগরতলা শহর এবং আগরতলার সীমান্তবর্তী বগাফার জঙ্গলে কাজ করছিল তাঁরাও এসে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসে কাজ শুরু করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আব্দুস শাকের, আবদুল্লাহ আল ফারুক, মোস্তফা আনোয়ার, আমিনুর রহমান, আবুল কাশেম সন্দীপ, রাশেদুল হোসেন, ফরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী ও হাবিব উদ্দীন আহমদ প্রমুখ। প্রথম দিকে যেসব অনুষ্ঠান নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার চলছিল। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের আগমন ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে আরো বৈচিত্রময় অনুষ্ঠান সংযোজন হল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, এম আখতার মুকুল, তোয়াব খান, জালাল উদ্দিন প্রমুখ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দর্শক প্রিয়তা উর্ধ্বগতির সাথে সাথে অনুষ্ঠানেও নতুনত্ব আসতে থাকে। প্রয়োজনে কিছু অনুষ্ঠান সংযোজন করতে হয়। প্রথমে যেসব গান বাজতো তা সময়ের তাগিদে পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে বেশি গান বাজতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, গাজী মাজহারুল আনোয়ার ফজল এ খোদা, সত্যেন সেন প্রমুখের গান। পরবর্তীতে বিষয়ভিত্তিক এবং যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক গান তৈরী হওয়ার পর সঙ্গতকারণে বেশি বাজতো। গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, গোবিন্দ হালদার, আলতাফ মহামুদ, সমর সেন, অংশুমান রায়, প্রমুখের গান বেশি বাজতো নিয়মিত অনুষ্ঠান মালায়। সংযোজনে বৈচিত্র্যময় উপদান থাকলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নতুন অনুষ্ঠান সংযোজিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল্ল না বললে চলে। নাটক, জীবন্তিকা, রক্তের আখরে লিখি, বজ্রকণ্ঠ, অগ্নিশিখা, জল্লাদের দরবার, মুক্তিসংগ্রামে মায়ের সূর্যশপথ, প্রতিধ্বনি, জনতার আদালত, আজব অভিজ্ঞান, দপণি প্রতিদিনের কণ্ঠ, দুর্জয় বাংলা, বেঈমানের দলিল, জয়যাত্রা রণাঙ্গনে এবং বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ এর মত চমৎকার সব অনুষ্ঠানের নামই প্রমাণ করে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে গুরুত্ব কতটা থাকতে পারে। কয়েকটি অনুষ্ঠানের নাম এখনও বেশ উচ্চারিত হয়। এম আখতারের চরমপত্র, ড. মাজহারুল ইসলাম এর সলিমুল্লাহ, মহাদেব সাহা ড. এ আর মল্লিক ও আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথিকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জাগিয়ে তোলার মত গণসংগীত অত্যন্ত সমাদৃত হয়। বেতারের অনুষ্ঠান সাধারণ জনগণসহ রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের সঙ্গী ছিল বলেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলা হয়। বেতারের ক্ষুরধার কার্যকরী এবং প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানমালা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই চট্টগ্রাম থেকে দেশপ্রেমিক কয়েকজন কাজ শুরু করেছিলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হিসেবে। এ অধিবেশনের চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান নিজের পরিচয়সহ 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।[২]

এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, তার শ্যালক আসাদুজ্জামান (হেলাল), লন্ডন প্রবাসী হোটেল আগ্রাবাদের তৎকালীন অস্থায়ী বোর্ডার মাহমুদ হোসেন, সহকারী ম্যানেজার ফারুক আহমেদ এবং সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা। কালুর ঘাটের বেতার কেন্দ্রের সাময়িক প্রহরায় তত্ত্বাবধায়ক

লে. শমশের মোবিন তার সিনিয়র মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিতে বলায় ২৮ মার্চ দুপুর থেকে নাম হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এই সান্ধ্য অধিবেশনের মেজর জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠ ঘোষণার অনুবাদটিও অন্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচার করা হয়েছিল। বাংলা অনুবাদের সময় সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমদ। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল, মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। বাংলাদেশের সর্বত্র দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।[৩]

এ বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, দেশাত্ববোধক গান, সংবাদ ইত্যাদি বেশ আগ্রহের সাথে প্রচারিত হতে থাকে। আশেপাশের লোকজন ও বেতার কেন্দ্রটির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের খাবারসহ সকল সহযোগিতা করতে থাকে। ২৬ শে মার্চ থেকে শুরু করে বেতার কেন্দ্রটি ৩০শে মার্চ দুপুর পর্যন্ত বিনা বাধায় চলতে থাকে। এ কয়দিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাঙালি মুক্তিকামী জনতার নিকট পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী টের পেয়ে ৩০ মার্চ দুপুর একটার সময় ট্রান্সমিটার ভবনে বিমান ফিডারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এরপর এ ট্রান্সমিটার হতে অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের সান্ধ্য অধিবেশনে আবুল কাসেম স্বন্দীপ এর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা বিষয়ক ছোট সংবাদ বুলেটিন প্রচার করেছিলেন। তারবার্তায় বঙ্গবন্ধুর যে স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল তা অনুবাদ করেছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল ফারুক ও সুলতানুল আলম।[৪]

১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রান্সমিটার স্থাপনে যে কঠোর পরিশ্রম করে একস্থান থেকে অনত্র নেয়া হয়েছিল তা দেশ প্রেম হীন এ ধরণের কর্ম সম্পাদন অসম্ভব। হাটহাজারী, নাজিরহাট, রাউজান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রাঙ্গুনিয়া চন্দ্রঘোনা এসব অঞ্চল পার হয়ে ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চল রামগড়ের বগাসর জঙ্গল থেকে ৯ এপ্রিল বিকাল ৫ টা থেকে প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। ৬০ ওয়াট শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার দিয়ে কর্ণেল মুখার্জীর দায়িত্বে থাকা বিএসএফ এর ক্যান্টনমেন্ট এর নিকটেই বগাফার জঙ্গলেই আবার চালু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিবেদিত প্রাণ দক্ষকর্মী ৫ জন করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। রামগড়ে যে পাঁচ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন তারা হলেন সৈয়দ আব্দুস শাকের, ইমনুর রহমান, রেজাউল করিম চৌধুরী, কাজী হাবিব উদ্দিন ও মোঃ রাশিদুল হোসেন। আগরতলা শহর থেকে যে অংশটি প্রচারিত হচ্ছিল তা বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রত্যাশীরা বাঙালি স্বাধীনতার সুসংবাদ শুনার জন্য অত্যন্ত সন্তর্পনে কালের কাছে রেডিও নিয়ে অপেক্ষা করত। একটি ভালো সংবাদ শুনলে পুলকিত হতো। তা সম্ভব কেবল রেডিও নাম বস্তুটির মাধ্যমে। এই আকাঙ্খিত বস্তুটি চালু রাখতে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে এসেও ভোগান্তি শেষ হয়নি। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ভারত সরকারের সহযোগিতায় ৫০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার পাওয়া গেলেও যে রেকর্ডিং মেশিন পাওয়া গিয়েছিল তা চালানোর লোক ছিল না। বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল বিদেশী লোকবল নেয়া হবে না। অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা নিয়ে আশফাকুর রহমান ও টি এইচ শিকদারের কারিগরী সহায়তায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়েছিল। শুরুকালীন সময়ে যে লোকবলের অভাব ছিল পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেশের কাজ করার লক্ষ্যে মুক্তিকামী

মানুষের অভাব ছিল না। সাধারণ গনঘণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপশি মুক্তিযোদ্ধাদের সতেজ ও মনোবল অটুট রাখার জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের সাথে সাথে আরো বৈচিত্র এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের কথা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করা শরু করল। যেমন বাংলা ও ইংরেজী অনুষ্ঠানের পর উর্দুতে অনুষ্ঠান করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর কারণ ছিল বাঙালি বীর জনতার কাছে যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নাস্তানুবুদ হচ্ছে তা ব্যঙ্গ রসের মাধ্যমে তুলে ধরা। বাঙালির বিজয়ের সংবাদ শুনে যে পাকিস্তানী আগ্রাসী বাহিনী দুর্বল হয় সে লক্ষ্যেই উর্দু সার্ভিস চালু করা হয়েছিল। জাহিদ সিদ্দিকীকে প্রধান করে চালু করা উর্দু সার্ভিস বেশ সার্থক হয়েছিল। অনেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে হতো। কর্তৃপক্ষের অনেক সিদ্ধান্ত সরকারের একমাত্র প্রচার মাধ্যম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রচারের ব্যাপাওে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অপারগ ছিল। কারণ স্টুডিও যেখানে ছিল ট্রান্সমিশন হাউস ছিল প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের নিকটে ছিল ট্রান্সমিশন হাউস। ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্টডিওতে রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানমালা বিএসএফ এর নির্ধারিত জোয়ানরা অত্যন্ত সন্তর্পনে ট্রান্সমিশন হাউসে পৌঁছে দিত। তাই রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানসমূহ আগেই প্রস্তুত রাখা বাঞ্ছনীয় ছিল। এ কারণে অনেক সময় অসুবিধা প্রকট আকার ধারণ করত। কলকাতায় লাগাতার বন্ধ চলত তখন। বন্ধ হলে আগাম অনুষ্ঠান বানানোর প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু অনুষ্ঠান তৈরী করে আগাম পাঠিয়ে দিতে হতো। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পেত সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে লোমহর্ষক কাহিনী । তবে নতুন নতুন উদ্দীপনামূলক ও দেশাত্বধোক সঙ্গীত ছিল অগ্রাধিকারে। সঙ্গীত যে যুদ্ধরত দেশপ্রেমিককে কতটা জাগিয়ে তুলতে পারে তা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়া যায়। যেমন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা অংশুমান রায়ের সুর ও গাওয়া গান 'শোন একটি মুজিবারের থেকে', আপেল মাহমুদের কথা ও সুরে 'তীর হারার এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব' যে গোবিন্দ হালদারের 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে/রক্ত লাল রক্ত লাল' ইত্যাদি।

এসব সাড়াজাগানো গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিল। আর এসব সম্ভব হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-এর কারণে। স্বাধীন ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা :

জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে যাঁরা ছিলেন : আব্দুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত এম এন এ, জিল্লুর রহমান, সদস্য উপদেষ্টা পরিষদ, আব্দুল খালেক, সদস্য উপদেষ্টা পরিষদ, তাহের উদ্দীন ঠাকুর, সদস্য উপদেষ্টা পরিষদ। আনোয়ারুল হক খান, তথ্যসচিব, প্রবাসী সরকার, '৭১, ফজলুল হক ভুঁইয়া, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট, অজিত কুমার দত্ত, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আশরাফ উদ্দীন, সহকারী দলিল রক্ষক, প্রশাসনিক বিভাগ, প্রণোদিত বড়ুয়া, কণ্ঠশিল্পী, আবুল বরকত, প্রশাসন বিভাগ, দেলোয়ার হোসেন, প্রশাসন বিভাগ, অফিস এসিস্ট্যান্ট হিসেবে যারা ছিলেন তারা হলেন : মহিউদ্দীন আহমেদ, আনোয়ারুল আবেদীন, জাহাঙ্গীর আলম। স্টেনো টাইপিস্ট যারা ছিলেন : আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, কালিপদ রায়। অনিল কুমার মিত্র, হিসাব রক্ষক, এস. এ. সাজ্জাদ হোসেন, স্টুডিও নির্বাহী কাম-রিসিপশনিস্ট, পিওন হিসেবে যারা ছিলেন : বিমর কুমার নিয়োগী, শাখাওয়াত হোসেন, সত্য নারায়ন ঘোষ, মোঃ

শামসুল হক। কাজী হাবিব উদ্দীন আহমেদ (মণি), অনুষ্ঠান সচিব, অনুষ্ঠান বিভাগ, এ.কে. শামসুদ্দিন, উপস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক, উপস্থাপনা বিভাগ, শামসুল হুদা চৌধুরী, অনুষ্ঠান সংগঠক (সিনিয়র) প্রশাসন, বেলাল মোহাম্মদ, অনুষ্ঠান সংগঠক, অনুষ্ঠান বিভাগ। অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যারা ছিলেন : মুস্তফা আনোয়র, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, মেজবাহউদ্দীন আহমেদ, তাহের সুলতান, মোহাম্মদ ফারুক (শাজাহান ফারুক), টি. এইচ শিকদার, মোঃ নজরুল ইসলাম (অনু ইসলাম), আশরাফুল আলম, আলী জাকের (ছন্দনাম-আবু মোহাম্মদ আলী), মোস্তাফিজুর রহমান (গামা), শহীদুল ইসলাম। সৈয়দ হাসান ইমাম (ছন্দনাম-সালেহ আহমদ), প্রযোজক, ড্রামা, বাংলা সংবাদ পাঠক, রনেন কুশার, প্রযোজক, নাট্য বিভাগ, কামাল লোহানী, ইনচার্য নিউজ, বার্তা বিভাগ। সাব এডিটর হিসেবে যারা ছিলেন : আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মনসুর মামুন (ম. মামুন),সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া, মৃনাল কৃষ্ণ রায়, নিরঞ্জন অধিকারী (ছন্দনাম-সবুজ চক্রবর্তী), জাহিদ সিদ্দিকী, শহিদুর রহমান, রণজিৎ পাল চৌধুরী, এ. কে. এম. জালাল উদ্দিন। আলমগীর কবীর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইংরেজি অনুষ্ঠান।[৫]

বাংলা সংবাদ পাঠক হিসেবে যারা ছিলেন : নুরুল ইসলাম সরকার, আলী রেজা চৌধুরী, মঞ্জুর কাদের বাবুল (ছন্দনাম-বাবুল আখতার)। পারভীন হোসেন, সংবাদ পাঠক (ইংরেজি ও উর্দু), নাসরিন আহমেদ (ছন্দ নাম-জেরিন আহমেদ), সংবাদ পাঠক (ইংরেজি/কণ্ঠশিল্পী), ফিরোজ ইফতেখার, সংবাদ ফাক, (ইংরেজি/নাট্যশিল্পী), আমিনুল হক বাদশা, পর্যালোক, বার্তা বিভাগ, আমীর হোসেন (আলী), পর্যালোক, বার্তা বিভাগ। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে যারা ছিলেন : মির্জা মোঃ ইউনুস আলী (আবু ইউনুস), মোহসীন রেজা, মোতাহার হোসেন। সৈয়দ আব্দুস শাকের, প্রকৌশলী। টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট (প্রকৌশলী বিভাগ) হিসেবে যারা ছিলেন : মোমিনুল হক চৌধুরী, মো. রাশিদুল হোসেন, মোঃ আমিনুল রহমান, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী। টেকনিক্যাল অপারেটর (প্রকৌশলী বিভাগ) হিসেবে যারা ছিলেন : আ.ম. শরফুজ্জামান, প্রণব চন্দ্র রায়, মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী। এম. আর. আকতার মুকুল, লেখক ও পাঠক, চরমপত্র, এজাজ হোসেন ও রসুল আশরাফ চৌধুরী, মনিটর। আবু তোয়াব খান, কথক/সাংবাদিক, নাসিমুল কাদের চৌধুরী, কবি/আবৃত্তিকার, ফয়েজ আহমেদ, সাংবাদিক/লেখক, বদরুল হাসান, লেখক, এম. সাদেকীন, কথক, এ এম শফিউর রহমান, রেকর্ডিং সুপারভাইজার, রঙ্গলাল দেব চৌধুরী, টেপ লাইব্রেরী। অনুলিপিকার হিসেবে যারা ছিলেন : দুলাল রায়, একরামুল হক চৌধুরী, নওয়াব জামান চৌধুরী, বরকত উল্লাহ। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে যারা ছিলেন : মাওলানা নুরুল ইসলাম জেহাদী, মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী, মাওলানা শেখ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মাওলানা এম. আর জেহাদী, হাবিবুর রহমান, এ. এ. ফারুকী, ডেভিড প্রণব দাস জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বিনয় কুমার মন্ডল, রণধীর বড়ুয়া। স্বরচিত কবিতা পাঠ হিসেবে যারা ছিলেন: আসাদ চৌধুরী, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, প্রণব চৌধুরী, বিপ্লব দাস, মহাদেব শাহা, মিজানুর রহমান চৌধুরী। শিকদার ইবনে নূর, মো. রফিক, রফিক নওশাদ, এ রহমান। লেখক/পাঠক হিসেবে যারা ছিলেন : বিপ্রদাশ বড়ুয়া, লেখক, ড. মযহারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান। মোহাম্মদ শাহ বাঙালি, পুঁথিপাঠ/কণ্ঠশিল্পী। গীতিকার হিসেবে যারা ছিলেন : আকতার হুসেন, আলী মহসিন রেজা, আল মুজাহিদী, খাজা সুজন, নেওয়াজিস

হোসেন খন্দকার, টিপু চৌধুরী, নঈম গরহর, ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া, সারওয়ার জাহান, রজব আলী দেওয়ান। কণ্ঠশিল্পী/সঙ্গীত পরিচালক/গীতিকার/সুরকার হিসেবে যারা ছিলেন : অজিত রায়, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, আপেল মাহমুদ, মো. আব্দুল জব্বার, অজয় কিশোর হোর, অমিতাভ সেন গুপ্ত, অনিল কুমার দে, অনিতা বসু, অহিদুল হক, আজহারুল ইসলাম, আবু নওশের, আফরোজ মামুন, অরুণা রাণী সাহা, অর্চনা বসু, অরূপ রতন চৌধুর, আরতি ধর, আলোকময় নাহা, ইন্দ্র মোহন রাজবংশী, ইন্দু বিকাশ রায়, ইকবাল আহমেদ, উমা চৌধুরী, কাদেরী কিবরিয়া, কে. সি রায়, কল্যাণী ঘোষ, কল্যাণী মিত্র, কুইন মাহজাবিন, কণা, কাঞ্চল তালুকদার, মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ, গীতশ্রী সেন, গৌরাঙ্গ সরকার, গোপাল কৃষ্ণ দাশ, চিত্ত রঞ্জন ভূঁইয়া, ছন্দা ভুঁইয়া হাজরা, জগদীশ চন্দ্র কর্মকার, জয়ন্তী লালা (ভুঁইয়া), মোঃ জগলুল হক জোয়ার্দার, জীবন কৃষ্ণ দাশ, ঝর্ণা ব্যানার্জী, তোরাব আলী শাহ, তিমির নন্দী, তরুণ রায়, তপন মাহমুদ, তপন কুমার সাহা, লাকী আখন্দ, দীপা ব্যানার্জী, দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস, মিতা ঘোষ, নায়লা জামান, ননী গোপাল দত্ত, ডালিয়া নওশিন, পরিতোষ কুমার সাহা, পারভীন আখতার (বুলা মাহমুদ), প্রবাল চৌধুরী, প্রদীব ঘোষ, প্রণব চন্দ্র ঘোষ, প্রণদিৎ বড়ুয়া, ফকির আলমগীর, ফ্লোরা আহমেদ, বুলবুল মহলানবীশ, বিপুল ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, ভক্তি রায়, ভারতী ঘোষ, মুকুল চৌধূরী, মজিবুর রহমান, মাহমুদুর রহমান বেণু, খন্দকার এমদাদূল হক (মান্না হক), মকসেদ আলী খান সাঁই, মোঃ মোশাদ আলী, মনোরঞ্জন সরকার, মনোরঞ্জল ঘোষাল, মোঃ মনোয়ার হোসেন খান, মোঃ রেজাউল করিম (রব), এম. এ. মান্নান, এম. এ. খালেক, মোস্তফা তনুজ, মোশাররফ হোসেন, মামুন আল চৌধুরী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, মলিনা দাশ, মহিউদ্দিন খোকা, মফিজ আঙ্গুর, মাধুরী আচার্য, মদন মোহন দাস, সরোয়ার জাহান, মৃন্ময় দাশ গুপ্ত, মৃণাল ভট্টাচার্য, মঞ্জুর, আহমেদ, মঞ্জলা দাশ গুপ্তা, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, মালা খুররম (পূর্ব নাম-মালা-খান), মলয় কুমার গাঙ্গুলী, মিতালী মুখার্জি, মিহির নন্দী, মিহির লালা, মিলিয়া গনি, মিনু রায়, শক্তি শিখা দাশ, শাহীন সামাদ, শিলা দাশ, শিলা ভদ্র, শিপ্রা ভদ্র (রায়), শেখ জমির উদ্দিন, শেখ নাসির উদ্দিন, শেফালী ঘোষ, শেফালী স্যান্যাল, শিব শঙ্কও রায়, শক্তি মহলানবীশ, শারমিন সোনিয়া মুর্শীদ, শর্মিলা দাস, শহীদ হাসান, শফিকুল আলম, সখিনা বেগম, শাউন নবী, সাধন সরকার, শাহ আলী সরকার, সমর দাশ, এস, এম, আব্দুল গনি বোখারী, সরদার আলাউদ্দিন আহমেদ, সনজিদা খাতুন, সুকুমার বিশ্বাস, সুব্রত সেন গুপ্ত, সুবল দাশ, সুশীল কুমার চক্রবর্তী (ভানু), শুক্লা ভদ্র, সুজিত রায়, স্বপন চৌধুরী, স্বপ্না রায়, সাইদুর রহমান, সৈয়দা নাজনীন নীনা, সৈয়দ মহিউদ্দিন হায়দার, সৈয়দ আলমগীর লীনা দাস, রঞ্জন ঘটক, রেজাওয়ানুল হক, রেহেনা বেগম, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রীতা ব্যানার্জী, রথীন্দ্র নাথ রায়, মো. রফিকুল আলম, রূপা ফরহাদ, রমা ভৌমিক, হেনা বেগম, রেহানা বেগম, রাণী প্রভা চৌধুরী, হরলাল রায়, হযরত আলী বয়াতী, লীনা দাশ। যন্ত্রশিল্পী/সুরাকার/সঙ্গীত পরিচালক/নাট্যশিল্পী হিসেবে যারা ছিলেন : অবিনাশ চন্দ্র শীল, অরুণ কুমার গোস্বামী, কালাচাঁদ ঘোষ, গোপী বল্লভ বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর হায়াৎ খান (রুমু খান), জাহিদ হোসেন প্রধান, মোজাফফর হায়াৎ খান (জুলু খান), তাসসেন খান, তড়িৎ হোসেন খান, নিতাই চন্দ্র শীল, দিলিপ দাশ গুপ্ত, দিপক মুখার্জী, দেবু চৌধুরী, বাবুল দত্ত, বাসুদেব দাস, সমীর দাস, সুজেয় শ্যাম, সুবল দত্ত, সুনীল কুমার গোস্বামী, স্বপন কুমার সাহা, শেখ সাদী খান, শতদল সেন, রংগলাল দেব চৌধুরী, হরেন চন্দ্র লাহিড়ী, অনুপম সেন, আবুল মঞ্জুর, অমিতা বসু,

আতাউর রহমান, আজমল হুদা মিঠু, আব্দুল জলিল মিন্টু, আসাবুদ্দিন খান, আসলাম পারভেজ, ইফতেখারুল আলম, ইয়ার মোহাম্মদ, করুণা রায়, কল্যাণ মিত্র, কাকিয়া বসু, কাজী মিসবাহুল নাহার, খান মুনির, গোলাম রব্বানী, জহিরুল হক, তরুণ কুমার মহলানবীশ, তাজিন মাহনাজ মুর্শীদ, তোফাজ্জল হোসেন, দিলশাদ বেগম, দিলিপ সোম, দিলীপ চক্রবর্তী, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, নারায়ন ঘোষ মিতা, প্রসেনজিত বোস, পূর্ণেন্দু সাহা, মালা খান, বাদল রহমান, মাসুদা নবী, যদন শাহু, মামনুর রশিদ, মাযহারুল ইসলাম, মালা চৌধুরী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার বিশ্বাস, সুভাস দত্ত, সুফিয়া খাতুন, সুমিতা দেবী, সৈয়দ দীপেন, সৈয়দ মোহাম্মদ চান (চান প্রবাসী), শিল্পী মহলানবীশ, সমীর কুশারী, রুনু আহমেদ, রাজু আহমেদ, রাশেদুর রহমান প্রধান, লায়লা হাসান।[৬]

কথক/লেখক/স্বরচিত কবিতা পাঠ/লেখক/পাঠক/ছোটগল্প লেখক/সংগঠক হিসেবে যারা ছিলেন : আব্দুল গফফার চৌধুরী, আহমেদ নাদিম, অনুপম সেন, অরূপ তালুকদার, অধ্যাপক এম এ সুফিয়ান, অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, আবু রাহাত মো. হাবিবুর রহমান, দীপ্তি লোহানী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, আবু মাসুদ, আব্দুল মান্নান (ছদ্মনাম-আহমেদ রফিক),আব্দুল জলিল, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, আব্দুস সালাম, এ.বি.এম. শাহাবুদ্দিন, আবুল মঞ্জুর, মো. আবু জাফর (ছন্দনাম-জাফর সাদেক), মো. আশরাফ উদ্দিন, কুলকুম আসাদ, কমল কৃষ্ণ গুহ, কামরুল হাসান, খন্দকার মকবুল হোসেন, গাজীউল হক, গাজীউল হাসান, জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, জহির রায়হান, জাহাঙ্গীর আলম, জলি জাহানুর, জামিল আখতার, জেবুন্নাহার আইভি (আইভি রহমান), দেবেশ দাশ, দিলিপ কুমার ধর, দীপা ব্যানার্জি, নরেন বিশ্বাস, নূরজাহান মযহার, নূরে আলম, নুরুল হক, নিখিল রঞ্জন দাস, টি. হাসান, ডাক্তার নুরুন্নাহার জহুর, ডা. ইবনে গোলাম সামাদ, পাভীন আখতার, প্রণব চৌধুরী, বাসনা গুণ, বুলবুল ওসমান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, বেগম মুশতারি শফি (উম্মে কুলসুম), মাহমুদ শাহ কোরেশী, মাহমুদা ফারুক, মাহমুদুল্লা চৌধুরী, মাহমুদা খাতুন, মেহের খন্দকার (ছদ্মনাম-সেলিনা খন্দকার), মুজিব বিন হক, নিখিল রঞ্জন দাশ, এম. রহমান, মলয় ভৌমিক, মাহবুব তালুকদার (ছন্দনাম-কামাল মাহবুব), মতিন আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ মুসা (ছন্দনাম-মুসা সাদেক), মিস ডলি নাথ, ডক্টর অজয় রায়, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর এ. জি সামাদ, ডক্টর এ আর মল্লিক, মির্জা নূর রহমান, এ কে এম আমিনুল ইসলাম, ডক্টর এ. ইসলাম, ডক্টর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ডক্টর মাহমুদুল্লাহ চৌধুরী, ডক্টর বেলায়েত হোসেন, ডক্টর মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ডক্টর সুলতানা সরোয়ার জামান, ডক্টর রঙ্গ লাল সেন, সাধন কুমার ধর, শামীম চৌধুরী, শামসুল আলম সাঈদ, রেবা আখতার, শওকত আরা হাফিজ, সন্তোষ গুপ্ত, শুভ্রা চৌধুরী, রনেশ দাশগুপ্ত, সেকান্দার মকবুল হোসেন, সুকুমার বিশ্বাস, সলিমুল্লা (ছদ্মনাম-ইলিয়াস আহমেদ), হাসান মুরশিদ (ছন্দনাম-গোলাম মুরশিদ), হাফেজ আলী, সুকুমার হোর, শওকত ওসমান, রাফিয়া আখতার ডলি, রেজওয়ানুল হক।

মৃত কিংবা জীবিত ভারতীয় (কলকাতা) গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী যাদের গান স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। গীতিকার/সুরকার হিসেবে যারা ছিলেন : গোবিন্দ হালদার, গৌরি প্রসন্ন মজুমদার, সলিল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, শ্যামল গুপ্ত, শ্রী ভবানন্দ, বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (ডি এল রায়), হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভুপেন হাজারিকা, অংশুমান রায়, বাপ্পী লাহিড়ী, অমল মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, শান্তি মুখার্জি। আবৃত্তিতে কাজী সব্যসাচী, সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, প্রণনেশ সেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দে অংশগ্রহণকারী ও প্রচার সংশ্লিষ্টদের বিষয়ভিত্তিক সূচি [৭]

ক্রমিক	পদ/বিষয়	সংখ্যা
১।	উপদেষ্টা পরিষদ	৫ জন
২।	দাপ্তরিক কর্মী	৭৯ জন
৩।	প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী	
	ক) সংবাদ পাঠক বাংলা, ইংরেজি, উর্দু	১৫ জন
	খ) অনুষ্ঠান ঘোষক	৫ জন
	গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান	১০ জন
	ঘ) স্বরচিত কবিতা পাঠ	২৩ জন
	ঙ) পুঁথি পাঠ	১ জন
	চ) গীতিকার	৫৪ জন
	ছ) কণ্ঠশিল্পী	১৫৮ জন
	জ) সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক	২২ জন
	ঝ) যন্ত্রশিল্পী	২৬ জন
	ঞ) নাট্যকার, নাট্যশিল্পী	৪৯ জন
	ট) কথক	৯০ জন
	ঠ) বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য জানিয়েছেন	২৪ জন
	ড) ছোট গল্পকার	২৫
৪।	বাংলা বেতারকেন্দ্রে যাননি অথচ গান রয়েছে	২৩ জন
৫।	ভারতীয় গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী	১০ জন

পাশ্চাত্য শিল্পীদের নাম ছিলেন জর্জ হ্যারিসন, কণ্ঠশিল্পী. ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, সরোদ, শিল্পী পন্ডিত রবি শংকর, সেতার শিল্পী, ওস্তাদ আল্লা রাখখা খাঁ, তবলা শিল্পী, ইহুদি মেনুহীন বেহালা শিল্পী।

৩ জুন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা নামে একটি সংগঠন গঠিত হয় আগরতলার কলেজটিলায় কলেজ এমবিবি কলেজের নির্মীয়মাণ ভবনে।[৮]

শিল্পীদের নাম

০১.	এ কে এম কাইজুল্লাহ,	০২.	শংকর নাথ সাহা
০৩.	এস. এম. মহসীন	০৪.	সরদার আলাউদ্দিন
০৫.	হরি প্রসন্ন পাল	০৬.	অমল দত্ত
০৭.	সৈয়দ মামনুর রশিদ,	০৮.	চিত্ত রঞ্জন ভূঁইয়া
০৯.	এস. এম. সেলিম	১০.	সুধেন্দু চক্রবর্তী
১১.	মৃনাল কান্তি দত্ত	১২.	রবীন্দ্র লাল পোদ্দার

১৩.	কামাল উদ্দিন আহমেদ	১৪.	এস. এম. শাহজাদা
১৫.	হাফিজুল কবীর লেলিন	১৬.	মহিউদ্দিন খোকা
১৭.	সৈয়দ জহির হোসেন	১৮.	ছালাম কবীর
১৯.	বেণু চক্রবর্তী	২০.	অরূপ রতন চৌধুরী
২১.	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু	২২.	ফিরোজ আহমেদ
২৩.	সুজিত আরেং	২৪.	আজিজুল হক চৌধুরী
২৫.	এ. কে. এম. হারুনুর রশিদ	২৬.	আশিষ চৌধুরী
২৭.	অমল কৃষ্ণ মজুমদার	২৮.	ছায়া রায়
২৯.	জয়ন্তী ভূঁইয়া	৩০.	নিয়তি ভূইয়া
৩১.	সুমিত্রা ভট্টাচার্য	৩২.	গীতশ্রী চৌধুরী
৩৩.	জয়শ্রী চৌধুরী	৩৪.	দিলারা বেগম
৩৫.	শ্যামল কৃষ্ণ মজুমদার	৩৬.	শিখি কর
৩৭.	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	৩৮.	উমেশ চন্দ্র রায়
৩৯.	আমিনুল হক	৪০.	আব্দুল মঈন
৪১.	সিদ্দিক মিয়া	৪২.	নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
৪৩.	মেরাজ উদ্দিন আহমেদ	৪৪.	মো. মোতাহার হোসেন খান
৪৫.	মোঃ ওবায়দুল হক	৪৬.	মোঃ হুমায়ুন কবীর
৪৭.	মোঃ আব্দুস শহীদ	৪৮.	মোঃ মফিজুল ইসলাম
৪৯.	জসিম উদ্দিন আহমেদ	৫০.	শাহাবুদ্দিন আহমেদ
৫১.	মুক্তা চক্রবর্তী		
৫২.	এ. কে. এম. আজিল্লাহ		আহবায়ক, ইস্টার্ন জোন, মুজিবনগর
৫৩.	আব্দুল কুদ্দুস মাখন, এম.পি		এক্স মেম্বার, লিবারেশন কাউন্সিল, মুজিবনগর এন্ড এক্সিকিউটিভ মেম্বার বাংলাদেশ সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস একশন কমিটি
৫৪.	এমআর সিদ্দিকী, এমপি		এক্স-ইনচার্য ইস্টার্ন জোন, মুজিবনগর এন্ড মিনিস্টার ফর কমার্স, গভ. অব বাংলাদেশ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই জোরালো ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমই এ বেতার কেন্দ্রকে নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ২৭ মার্চেও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আগরতলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনটি-

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম সামরিক ঘাঁটি আমাদের দখলে আছে।' আর সন্ধ্যায় এই বেতার কেন্দ্র থেকে এই রকম ঘোষণা করা হয় : 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম ঘোষণা। বাংলা স্বাধীন। আমরা মার্শাল ল' মানিনা। আপনারা মার্শাল ল' মানবেন না। বীর বাংলার সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বাংলার পতাকা উড্ডীন। ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, খুলনা ও চট্টগ্রামে সামরিকবাহিনী আমাদের সঙ্গে আছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শত্রুর মোকাবেলায় সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকটি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট তারা অবরোধ করে রেখেছেন'।[৯]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বাঙালীরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল। কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সরকারের সকল অনুষ্ঠানই কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্র হতে প্রচার করা হতো।

এক্ষেত্রে কলকাতায় অবস্থানরত বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যম বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা পাওয়ার ক্ষেত্রে উৎগ্রীব থাকলেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই প্রাধান্য পেত। এই বেতার কেন্দ্র থেকেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নেতৃবৃন্দই প্রথম সরকারি নির্দেশনা প্রচারের চেষ্টা করতেন।

আকাশবাণী

আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তা দিলীপ সেনগুপ্ত কেন্দ্রের (দিল্লী) অনুমতিবিহীন কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২৫ মার্চ রাতের বর্ণনা এবং ২৬ মার্চের ঘোষণা প্রচারের ব্যাপারে দ্বিধাধীন হয়ে রেকর্ড করে রাখলেন। রেকর্ড করার জন্য আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের মহানির্দেশক দ্বীপেন চন্দ্র ভৌমিককে দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র অমরেন্দ্র নাথ ঘোষালকে দিয়ে তা করালেন। কিন্তু দিল্লী থেকে আকাশবাণীর অধিকর্তা ড. এ আর বাজী ফোন করে জানাবেন দিল্লী থেকে নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে খবর প্রচার করা যাবে না। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের অধিকর্তাকে দিল্লীতে যেতে বলা হলো বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে খবর প্রচারের নীতি নির্ধারণ করার লক্ষ্যে। তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সি আর দত্তের সভাপতিত্বে বৈঠক হলো। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণীর তদানিন্তন মহানির্দেশক অশোক সেন, উপমহানির্দেশক পিসি চ্যাটার্জী, সংবাদ বিভাগের অধিকর্তা ড. এ আর বাজী ও সংবাদ বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা কে এল শর্মা। তাদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে ক্যাবিনেট সচিব প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাথে তিন দিন আলোচনা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সকল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় সংবাদ বুলেটিনের সাথে সংবাদ পরিক্রমা, সংবাদ ভাষ্য ও পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান আকাশবাণীতে বাড়ানো হলো। এসব হয়েছিল পরিস্থিতি বিবেচনায়। সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রপ্ত করতে পেরেছিলেন যে আকাশবাণীর অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বেগমান করার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে প্রাণপাত করে সংবাদ বিভাগে কর্মরত কর্মীগণ কাজ করেছেন। বাংলাদেশকে ভালবেসে রাতদিন অকাতরে কাজ করেছেন দ্বীপেশ চন্দ্র ভৌমিক। তিনি বার্তা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। জনাব ভৌমিকের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সঠিক পরামর্শ ও যোগ্য নেতৃত্বের কারণে আকাশবাণী যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে কাজ করতে পেরেছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আগে ঢাকায় আকাশবাণীর হয়ে কাজ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ তাঁর পরিচিত হওয়াতে রণক্ষেত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। নির্মল সেনগুপ্ত সাব এডিটর হিসেবে কাজ করেছিলেন। জনাব নির্মলের সম্পদনায় 'সংবাদ সমীক্ষা' নামক একটি এক মিনিটের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্পর্শকাতর অংশ থাকত। প্রণবেশ সেন তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অন্তর উজার করা হৃদয় ও আবেগ মেশানো পাঁচ মিনিটের প্রতিবেদন তৈরী করতেন 'সংবাদ পরিক্রমা' নামক একটি অনুষ্ঠানের জন্য। 'সংবাদ পরিক্রমা'র প্রতিবেদন দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় যখন পাঠ করতেন সেসব এতোটাই আবেগময় হতো যে অনেক শ্রোতা আকাশবাণীর কার্যালয়ে ফোন করে বার বার প্রচারের অনুরোধ করতেন। বাংলাদেশের যুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিবেদন প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপনের জন্য পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঈষান্বিত ছিল। তার অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ভারত সরকার তাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২০১২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়কে 'মৈত্রী সম্মানা' (মরনোত্তর) স্মারক প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কিছু সংবাদকর্মী হৃদয়ে বাংলাদেশ

ধারণ করে কলকাতার সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের পথঘাট মাঠ যাঁর সুখ স্মৃতিতে সদা জাগ্রত সেই উপেন তরফদার মুক্তিযুদ্ধেও কোন সংবাদ পেলেই টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছুটে যেতেন যুদ্ধের ময়দানে। তার প্রযোজনায় 'সংবাদ বিচিত্রা' নামক একটি অনুষ্ঠান ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে লোভনীয় অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরো কয়েকজন সংবাদ পাঠক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গৌতম বসু, পিযুশ বন্দোপাধ্যায়, বরুন মজুমদার। সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন বিবেকান্দ রায়, পুলিশ বিহারী স্যানাল। পাকিস্তান রেডিও, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন বেতারের প্রচারিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব খবরাখবর হতো সেসব নিয়ে গবেষণা করে একটি প্রতিবেদন তৈরী আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগে দিতেন শঙ্কর দাশ গুপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক ঘটনা এবং সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'যুববাণী' থেকে প্রচারিত হতো কবিতা সিনহার প্রযোজনায়। কলকাতায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অবস্থান শরণার্থীদের নিয়ে কথিকা প্রচারিত হতো সরল গুহের তত্ত্বাবধানে। এ ছাড়া 'স্পেশাল বেঙ্গলী সার্ভিস' ও Special Bengali Service' নামে একটি নিয়মিত আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচারিত হতো। তাছাড়া আকাশবাণীর সংগীত বিভাগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উদ্দীপনামূলক সংগীত প্রচারিত হতো।

২৫ মার্চের তান্ডবলীলার করুণ আর্তনাদের শব্দচিত্রের রেকর্ড শুনে যে বিশ্ব গণমাধ্যমের কর্মীদের হৃদয়ের সুপ্ত মমতায় স্ফুরণ ধরেছিল । বাংলার বিপন্ন জনতার ওপর পাক হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ডের বীভৎস চিত্রে গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও সকল সহযোগী সদস্যের আত্মা কেঁপে উঠেছিল এবং সেই কম্পমান হৃদয়ের নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে সফল এবং সার্থক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুদ্ধের আসল চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছিল। আকাশবাণী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে সকল প্রচার চালিয়েছিল বিশ্বের অনেক সংবাদকর্মী তা অনুসরণ করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরীতে প্রত্যেক পরতে পরতে আকাশবাণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মতো যা আকাশবাণীর কর্মী উপেন তরফদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন ও দ্বীপেশ চন্দ্র ভৌমিক-এর স্মৃতিচারণে স্পষ্ট পাওয়া যায়। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা দাবী, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগী সদস্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা । পাকিস্তানের সরকার যখন ১৯৭০ সালের অভূতপূর্ব বিজয়লাভের পরও পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের বিস্ময়কর জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা করছিল তখনও আকাশবাণী প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিল। এসব টানাপোড়েনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে যে বিস্ময়কর ভাষণ প্রদান করেন তা বাঙালি জাতির নিকট শান্তির বার্তা নিয়ে চিরকালের গোলামীর থেকে মুক্তি দিশা নিয়ে এসেছিল। এই অভূতপূর্ব ভাষণ ৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিও থেকে প্রচার বারণ ছিল বলে প্রচার করা হয়নি। পরবর্তীতে অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ৮ মার্চ পাকিস্তান রেডিও থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হয়। এই ভাষণ আকাশবাণীর রেকর্ডিং বিভাগ রেকর্ড করে রাখে। রেকর্ডকৃত বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সংবাদ বিচিত্রায় প্রচারের জন্য

আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রযোজক উপেন তরফদারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর ভাষণটি নিয়ে যা করলেন তা ইতিহাস হয়ে থাকল। সংবাদ বিচিত্রায় উপেন তরফদারের অপূর্ব সৃষ্টি নিয়ে আকাশবাণী থেকে 'একটি জাতীর সংগ্রাম : একটি বন্ধুর ভূমিকা' শিরোনামে একটি সিডি বের হয়েছে যা শুনে শিহরণ জাগে। এ ব্যাপারে উপেন তরফদারের নিজের বর্ণনা : বঙ্গবন্ধুর রেকর্ড করা ভাষণের টেপ নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকলাম। কিন্তু ভাষণটি শুনে আমি তো প্রচন্তভাবে উত্তেজিত-শিহরিত! চোখ তুলে দেখি বহু সহকর্মীর ভিড়। শুধু আমি নই, সবাই ভাষণটি শুনে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে জ্বালাময়ী সহজসরল ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ, নানা অবিচার, অত্যাচার আর লাঞ্ছনার বেদনাময় কাহিনী অত্যন্ত জোরালোভাবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। ভাষণের শেষপর্বে উদাত্তকণ্ঠে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে আহবান জানিয়েছেন। মনে পড়েছে, বজ্রকণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর সেই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণা– 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব– বাংলাদেশের মানুষকে এবার মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ! কি যাদু ছিল সেই ভাষণে জানি না, সেই মুহূর্তে যদি সুযোগ থাকত তবে আমিও ওপার বাংলার ভাইবোনদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম– অস্ত্রহাতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম তাদের মুক্তিযুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে সাড়া দিয়ে যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, সংবাদ-বিচিত্রার জন্য ভাষ্য লেখার প্রয়োজন নেই। অংশুমানের গান আবার মুজিবের ভাষণ, এভাবেই গান আর ভাষণ দিয়ে সাজানো হলো সেদিনের 'সংবাদ-বিচিত্রা'। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি শুধু দুই বংলার অগণিত শ্রোতা নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এমনকি বিদেশে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য শ্রোতার দাবী মেনে অনুষ্ঠানটি একাধিকবার প্রচারও করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল তা হলো গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা অংশুমান রায়ের সুর ও কণ্ঠে 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবের/কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি' বিখ্যাত গানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। গানটি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। অংশুমানের গান ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অসাধারণ অনুষ্ঠান শুনে অনেক শ্রোতা আবেগ প্রবণ হয়ে বার বার প্রচারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আকাশবাণীর অনেক অনুষ্ঠানই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আবেগ মথিত হতো। এই অনুষ্ঠান শুনে শুধু কেবল শ্রোতাগণই অনুরণিত হয়েছিলেন তা নয়। আকাশবাণীর কলকাতার মুখ্য আধিকারিক দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক উপেন তরফদারকে অনুষ্ঠান প্রচারের পরের দিন বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলেছিলেন। এ ঘটনায় আকাশবাণীর সকলেই পুলকিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা আলাদা করে আর দরকার ছিল না, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা এমন অপরূপ প্রচারের পর। বার বার বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উচ্চারিত 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এসব অসাধারণ বাণী পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম আকাশবাণীতে প্রচারের পর ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একাত্বতা প্রকাশ ভিন্ন গন্ডির ছিল না। এরই ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গসহ

ভারতবর্ষ যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো তা গণমাধ্যমে বিশেষ করে আকাশবাণীতে বাংলাদেশের পক্ষে অকাতরে প্রচারিত হওয়ার কারণেই। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় যে তান্ডবলীলা চলেছিল সেসবের শব্দচিত্র আকাশবাণী সংগ্রহ করে সংবাদ বিচিত্রায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রচার করেছিল। সেই গোলাগুলির শব্দ-চিত্র আর সীমান্ত পেরিয়ে আসা বুলেটবিদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ তুলে ধরা হয়েছিল সংবাদ-বিচিত্রায়। মনে পড়ে, সেই অনুষ্ঠান চলাকালেই টেলিফোনে অনেক শ্রোতা সহ্য করতে না পেরে প্রচার বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ৯৯ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বিশেষ করে কলকাতার প্রায় বাড়িতেই বাংলাদেশ থেকে আগত জনগণ আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের পরিচিতি ছিল না তারা রাস্তাঘাটে মাঠে স্টেশনে দিনাতিপাত করেছিল। এতে শহরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। অথচ কলকাতাবাসীর আচরণে প্রত্যাশিত বিরক্তি ছিল না। এর মূল কারণ ছিল কলকাতাবাসীর মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি পূর্বে থেকেই তৈরী ছিল। এ কাজটি আকাশবাণী করেছিল। বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে অমানুষিক আচরণ পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার চালিয়েছে তা আকাশবাসীর প্রচারে স্পষ্ট ছিল। তাই বাংলাদেশের অসহায় জনগণ যখন আশ্রয়ের প্রত্যাশায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত হয় তখন তারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। যদিও আশ্রয় শিবিরগুলোতে এবং বিভিন্ন শহরের জনাধিক্যের কারণে অপ্রতুল অন্ন, বস্ত্রের এবং ঔষধপত্রের জন্য ভোগান্তিও কম ছিল না। এইসব কিছুই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আকাশবানী তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় তুলে ধরেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা দেয় যুদ্ধ পরিচালনা ও নির্দেশনা দেয়ার মতো নেতৃত্বের অভাব। বাংলাদেশের জনযুদ্ধ পরিচালনা এবং বর্হিবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য একটি সরকার খুবই জরুরিভিত্তিতে দরকার হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুসারি নেতৃবৃন্দ বিষয়টি অনুধাবন করেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তবে পশ্চিমবঙ্গের নিকটে একটি জায়গা নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ভারতের সহযোগিতায় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় সরকার (মুজিবনগর) গঠন করার পরিকল্পনা করলে ভারতের গণমাধ্যমে যেভাবে অকাতরে এগিয়ে এসেছিল তা অভাবনীয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অত্যন্ত গোপনে কলকাতা থেকে সাংবাদিক গিয়েছিলেন। ১৬ এপ্রিল রাত তিনটায় কলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হলে সংশ্লিষ্ট সকল সাংবাদিকদের সাথে আকাশবাণীর সাংবাদিক গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সরকার গঠন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যে গভীর আন্তরিকতা ও উদ্যমতা প্রত্যক্ষ করেছেন উপস্থিত সাংবাদিকগণ তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন আকাশবাণীর সাংবাদিক উপেন তরফদার। নিয়মিত সংবাদ বুলেটিনসহ 'সংবাদ বিচিত্রায় শপথ গ্রহণের বিস্তারিত বিষয় প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ করানো হয়েছিল। তবে সেদিনের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুই যে সর্বাগ্রে ছিলেনে তা উল্লেখ করে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও ১৭ এপ্রিলের রাতের আকাশবাণীর বিশেষ সংবাদ বিচিত্রায় বলিষ্ঠভাবে এসেছিল। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ইতিহাসের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়। এতে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সরকার যে আচরণ করেছে তা আকাশবাণীর সংবাদ পরিক্রমায় বিস্তারিতভাবে আসে। যা ১৯৭০

সালের ০৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে প্রভাব পড়ে। রেডিও পাকিস্তান তখন পূর্বপাকিস্তানের ব্যাপারে সঠিক সংবাদ প্রচার করত না। পূর্ব পাকিস্তানের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হতো আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালায়। আকাশবাণীতে অনেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : দিলীপ সেনগুপ্ত, দ্বীনেশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রণবেশ সেন, উপেন তরফদার, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তরুন চক্রবর্তী, শংকর দাশগুপ্ত, গৌরী ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, নিলাদ্রী শেখর বসু, কাজী সব্যসাচী, বিভূতি দাশ, কেকা মিশ্র, শম্ভু রায় চৌধুরী, সত্য বন্দোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দোপাধ্যায়, মিহির বন্দোপাধ্যায়, প্রবাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গীতা গঙ্গোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, সমরেন্দ্র নাথ, নির্মল সেনগুগুপ্ত, দেবব্রত রায় প্রমূখ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ যথাসময়ে প্রচার না করে প্রবল চাপের কারণে ৮ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় প্রচার হলো। তা প্রণবেশ সেনের পরামর্শে সহকারী বার্তা সম্পাদক বিভূতি দাশ রেকর্ড করার পর কলকাতার আকাশবাণীর কার্যালয়ে আনন্দের ফোয়ারা তৈরী হয়েছিল। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রণবেশ সেন অফিসে পোঁছতেই বিভূতি দাশ জড়িয়ে ধরে উৎফুল্লতা প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাদেশের ভাল কোন সংবাদ হলে সংবাদ কর্মীরা কর্তব্যের ঊর্ধ্বে উঠে এমনভাবে তা প্রকাশ করতেন যা হৃদয়গ্রাহী হয়ে যেতো। এসব ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য একটি দেশের শব্দ মাধ্যম এতোটাই আলোড়ন তুলেছিল যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। লক্ষ জনতার সমাবেশে শ্লোগান ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ আবার 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' আরও স্পষ্ট করে শ্লোগান উচ্চারিত হলো 'বাংলাদেশের মুক্তি চাই/ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই এসব কিছু মুহূর্তের আকাশবাণী প্রচার করে জানাচ্ছে। যারা এসব প্রচারের দায়িত্বে তাঁদের আবেগ ছিল আকাশচুম্বী। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিই যেন ছিল তাদের একমাত্র কথা। এ আবেগঘন প্রশংসা ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বরে লোকসভার অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছিলেন।[১০]

"নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতবাসী আজ একই লক্ষ্যের, একই পথের পথিক-আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একই আদর্শ ও ত্যাগে অনুপ্রাণিত ভারত ও বাংলাদেশের সরকার এবং জনসাধারণ পারস্পরিক সার্বভৌমিত্ব ও রাষ্ট্রসংহতি বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমান অধিকার এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা উপকারের ভিত্তিতে এক দৃঢ় মধুর সম্পর্ক গঠন করবে। এইভাবে একত্রে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আমরা সৎ-প্রতিবেশী হয়ে বাস করার এমন এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরব যাতে এই অঞ্চলে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং প্রগতি চিরস্থায়ী হয়। বাংলাদেশের প্রতি আমাদের শুভকামনা জানাই।" এ সংবাদ কলকাতার আকাশবাণীতে উপস্থিত প্রণবেশ সেন এর সম্পাদনায় নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিরতি ঘটিয়ে বিশেষ বুলেটিনে প্রচার

করা হয়েছিল। এ সংবাদ সার্কুলার রোড ও ৮ থিয়েটার রোডের বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ শোনার পর উৎফুল্ল প্রকাশ করেছিলেন।

বিদেশী অনেক রাজনৈতিক, সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনে আকাশবাণীর সাংবাদিক দোভাষীর কাজও করেছেন। তাদের জন্য এ কাজটি সহজ ছিল এই জন্য যে, উপেন তরফদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন মূলত বাংলাদেশের লোক হওয়াতে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আগত মানুষের আঞ্চলিক ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এ কাজটি বেশি করেছিলেন উপেন তরফদারই। বৃটেনের ৫ সদস্যের সংসদীয় দলের সদস্য ত্রাণশিবির দেখতে এসে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ তাদের পাকিস্তান থেকে জানানো হয়েছিল যে, ভারত থেকে মুসলিম জনগণকে অত্যাচার করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। অথচ বৃটিশ সংসদীয় দলের সদস্যরা পাকিস্তান পরিচালিত ত্রাণ শিবিরগুলো ফাঁকা দেখে এসেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ শিবিরগুলোতে এসে যে নিদারুণ ও করুণচিত্র দেখেছে তা রীতিমত অমানবিক। আকাশবাণী থেকে বারবার প্রচারের ফলে বিশ্ববাসী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আসল চিত্র জেনে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা : ২২শে জুন ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৭৫

২. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৩০

৩. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৪১

৪. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, ঢাকা : চেতনায় ঐতিহ্য, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ --

৫. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, ঢাকা : চেতনায় ঐতিহ্য, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ --

৬. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, ঢাকা : চেতনায় ঐতিহ্য, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ --

৭. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, ঢাকা : চেতনায় ঐতিহ্য, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ --

৮. দৈনিক কালান্তর, .. ১৯৭১

৯. ভবেশ দাশ, কলকাতা বেতার, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ২২৬।

১০. ভবেশ দাশ, কলকাতা বেতার, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-২৩৪।